চতুর্থ অধ্যায়,

লোকসংস্কৃতির জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে টোটো সম্প্রদায়ের মৌখিক সাহিত্যের পর্য্যালোচনা করবার উদ্দেশ্যেই আলোচ্য অধ্যায়টির অবতারনা। মানবসমাজের সাংস্কৃতিক (Cultural) জীবনের, ক্রমবিকাশের ধারার সংগে লোকসংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারা জড়িত। লোকসংস্কৃতির মধ্য দিয়ে জাতীয় চরিত্র সার্থকভাবে রূপায়িত হয়। তাই সমাজ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের চারিত্রিক ক্রমবিকাশ অনুসরন করবার এবং মনস্তত্ত্ব অনুশীলনের পক্ষে জাতির লোককথা একটি প্রধান অবলম্বন। লোকসংস্কৃতি সবসময়ই প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা অনুসরন করে। তাছাড়া এর ভিতর দিয়েই জাতীয় সমাজজীবনের অগ্রগতির ধারাটি অনুসরন করবার সুযোগ পায়।

প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব কিছু সমস্যা থাকে। টোটো সমাজের মৌখিক সাহিত্য এবং ধর্মীয় বিষয়গুলিকে বলা যেতে পারে দৈব নিগ্রহ এবং ধর্মীয় অনুগ্রহ। আর এই ধর্মীয় পর্য্যায়ভুক্ত হয়েও পরিবর্তিত হতে হতে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। এর ফলে মৌলিক অভিপ্রায়গুলি চাপা পড়ে গিয়ে নূতন অভিপ্রায়ের সৃষ্টি হয়। তবে একথা সত্যি যে, পরিবর্তন যাই হোক না কেন বিষয়টির মূল অভিপ্রায় অপরিবর্তিতই রয়ে যায়। ফলে প্রত্যেক জাতিরই উদ্দেশ্য ও সংস্কার - অনুযায়ী এক একটি অভিপ্রায় গুরুত্ব লাভ করে। এই সংস্কার বা উদ্দেশ্য

কখনও অন্য জাতির সংস্কার বা উদ্দেশ্যের সংগে এক হতে পারে না। বর্তমান টোটোপাড়ায় টোটোরা যখন প্রথম এসে বসবাস শুরু করে তখন লোকজীবন জটিল ছিলো না, মৌখিক ভাষাও ছিলো সীমিত। তাই তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন কার্যকলাপের উৎস সম্পূর্নভাবে খুঁজে পাওয়া যাবেই এ ভাবা যায় না। টোটোদের কোনও লিপি নেই, নেই কোনও লিখিত তথ্য। ধর্ম, দেবদেবী, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যা কিছু টোটোদের সার্বিক পরিচায়ক, সে সবকিছুই মুখে মুখে অস্তিত্ব রক্ষায় টিকে আছে।

টোটোদের লিখিত কোনও বর্ন বা অক্ষর নেই, কোনও লিপিও নেই। ক্ষেত্র-সমীক্ষায় জানা যায় যে, আদিকাল থেকেই মুখে মুখে শুনে তারা কথা শেখে, পরে ভাববিনিময় প্রকাশ হিসেবে তাই ব্যবহার করে। নিজস্ব কোনও লিপি না থাকবার ফলে তাদের লেখা কোনও প্রামান্য লিপি যা দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, তাও নেই। বর্তমানে টোটোরা যারা লিখতে এবং পড়তে পারছে তারা বাংলা ইংরেজীর মাধ্যমে কাজ করে। কেউ কেউ অল্প হিন্দী জানে। এর ফল হয়েছে দুঃখজনক এবং, নিরাশাব্যঞ্জকও বটে। কারন, আদিকালের বিভিন্ন ঘটনা, আচার, ধর্মানুষ্ঠানের নিয়মকানুন, মন্ত্র, স্তোত্র, গান,--সবকিছুই মুখে মুখে উচ্চারিত হতে হতে আসল রূপ বদল করে অনেক ভুলে ভরা উচ্চারনে এসে পৌঁচেছে।

এর কারন হোলো নিরক্ষরতা। লিখতে না জানবার কারনে এবং টোটোদের নিজস্ব কোনও লিপি না থাকবার ফলে তাদের অনেক কাহিনী, অনেক গান, মন্ত্র স্তোত্র হারিয়ে গেছে। তাছাড়া সমাজের যারা প্রধান, সেই পুরোহিতবৃন্দ তাদের শেখা মন্ত্র, স্তোত্র ইত্যাদি সকলকে দেয় না এবং শুদ্ধ ও পরিস্কার উচ্চারনে পাঠ করে না বলে একটা সীমিত গন্ডীর মধ্যে সেইসব মন্ত্র, স্তোত্র, গান, কাহিনী সবকিছুই বাঁধা পড়ে আছে।

টোটোরা মিলেমিশে থাকতে ভালোবাসে সার্বজনীন উৎসবগুলিতে সকলে একসংগে এসে একস্থানে মিলিত হয়। পুরোহিত এর নির্দেশ অনুযায়ী সকলে কাজ করে এবং পুরোহিতের নির্দেশ সকলে মেনে চলে। পুরোহিত টোটোদের কাছে দেবতার প্রতিভূ স্বরূপ। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন পূজা, বিভিন্নধরনের বিপদ আপদও অসুখের নিরাময়কল্পে পুরোহিতের দেওয়া নির্দেশাদি সব টোটোরা মেনে চলেন।

টোটোদের সামাজিক শৃংখলাবোধ প্রবল বলে মনে হয়। টোটোদের গোত্র মোট তেরটি। একসময় হিন্দুসমাজের চতুর্বর্নের মধ্যে যে, প্রবল ভেদাভেদ দেখা দিয়েছিলো, ছোঁয়াছুঁয়ির যে প্রবল বাছবিচার ছিলো, সেই ধরনের প্রবনতা এখনও

রয়েছে টোটোদের মধ্যে। বিশেষ করে বিয়ের সময় গোত্র এবং বংশপরম্পরা মেনে চলে টোটোরা। নিজ বংশ, গোত্র ছাড়া কেউ অন্য জাতি যেমন, বাঙালী, বিহারী, নেপালী, গারো ইত্যাদি জাতের সংগে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে সে টোটোপাড়ায় প্রবেশ করবার অধিকার হারায়। মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন এই নিয়ম বা রীতি লংঘন করে অন্য জাতের সংগে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, তারা টোটোপাড়ায় প্রবেশাধিকার হারিয়েছে। সামাজিক বিধান তাকে মেনে চলতেই হয়।

টোটোমেয়ের চার পাঁচ বছর বয়স হলেই টোটোছেলের বাবা মেয়ের বাবার সংগে যোগাযোগ করে 'বাণ্ডওয়া' বা 'বাকদান' করে রাখে। মেয়ে বড় হলে ছেলের বাড়ী পাঠাতে হয় অনুষ্ঠান করে। ঐ অনুষ্ঠানকে বলে 'নাম্রাশাক্সি' টোটোরা পিসি বা মামার মেয়েকে বেশ পছন্দ করে। তবে মাসির মেয়ের সংগে টোটোদের বিয়ে হয় না। সামাজিক এ নিয়ম টোটোরা সকলেই মেনে চলে।

গৃহদেবতা 'জি-রি'-র পূজা করবার বিধান আছে টোটোদের মধ্যে। 'জি-রি' নামের ঘর প্রত্যেক টোটোর বাড়ীতেই থাকে। বছরে দুবার এই ঘরের পূজা করতে হয়। হিন্দু সমাজের ঠাকুরঘরের সংগে এই 'জি-রি' নামের ঘরের মিল পাওয়া যায়। এই দেবতার পূজা করলে গৃহের সকলেরই ভালো করবেন তিনি, এটাই টোটোদের বিশ্বাস।

লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে ডা: চারু চন্দ্র সান্যাল মহাশয় ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে - "এক জায়গায় একদল লোক বহুকাল বসবাস করলে তাদের একটা সমাজ গড়ে ওঠে। এই সমাজে আপনা থেকেই কতকগুলি নিয়মকানুন, আচার ব্যবহার জেগে ওঠে। এইগুলি একত্রে সেই সমাজের সেই কালের সংস্কৃতি। ধর্ম পরিবর্তন অনেক সময়ে নতুন সংস্কৃতি নিয়ে আসে, অথবা পুরানো সংস্কৃতির ওপরে নতুন একটা প্রলেপ দেয় মাত্র। কিন্তু লোক লেখাপড়া শেখে। তারপর সেই পুরানো সমাজে বিভিন্ন ধর্মের লোক, বিভিন্ন ধর্মের সংস্কৃতির লোক বিভিন্ন কাজ নিয়ে বসবাস করতে আসে। তাদের আচার-ব্যবহার বদলে যায়। এমনিভাবে সমাজের পরিবর্তনের সংগে সংগে সংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তাই সংস্কৃতি সনাতন নয়। এটা চলতি।"

সমাজের খেটে খাওয়া মানুষ বংশপরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরন সযত্নে লালন ও ধারন করে চলেছে। আর এই লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলির স্রষ্টা নিরক্ষর মানুষ। কিন্তু প্রকৃতি, পরিবেশ, সংঘবদ্ধ সমাজজীবনের নানাবিধ কাজকর্ম সম্পর্কে তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যুগে যুগে তারা গান, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, লোককথা, কিম্বদন্তীর নানারকম উপাদানে লোকসংস্কৃতির অঙ্গনকে জীবন্তভাবে সাজিয়ে চলেছেন।

শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ বাস্কে মহাশয় লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে লিখেছেন, 'লোকসংস্কৃতি বিকাশে যেমন প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক পরিবেশের সক্রিয়তা প্রত্যক্ষ করা যায়, তেমনি দেশ বিশেষে জাতীয় লোকসংস্কৃতি বিকাশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়।

শ্রী দিব্যজ্যোতি মজুমদার লিখেছেন, 'বিশ্বের লোকসমাজের মৌখিক সাহিত্যের নিদর্শনসমূহ বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি প্রান্তের মানুষের মধ্যে মানসিক অভিপ্রায়ের আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য রয়েছে। বাঁচার তাগিদ ও পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কৌশল নানাধরনের হলেও লক্ষ্য একমুখী। তাই এক গোষ্ঠীর সংস্কৃতির

সংগে অন্য গোষ্ঠীর সংস্কৃতির যে বিরোধ, বিভেদ, স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় তার আসল পরিচয় মানবিক সেতুবন্ধনে। ---------

--------- লোককথা লোকসমাজের বিস্ময়কর জ্ঞানের অনন্য সম্পদ। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের জনজাতি আদি কাল থেকেই সামাজিক ও ধর্মীয় প্রয়োজনে তাদের আশা-আকাংখা, বেদনা-ব্যর্থতা, হতাশা, সংগ্রাম, প্রেম ইত্যাদির কথা মৌখিকভাবে লোকসাহিত্যের মাধ্যমেই ধরে রেখেছে।"

লোকসংস্কৃতি বহমান নদী। তা একইভাবে চলতে পারে না। শ্রী নন্দলাল বসুর বক্তব্য, ---

"There is no point in prisoning the art of the pats by keeping them (Patuas) blind and hiding from them their sight of all kinds of art . . .

The themes give pats were generally mythological. But people now a days do not care for Gods or Goddess. People are no longer religiously oriented."

শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ বাস্কে মহাশয় আরও বলেছেন, যুগ যুগ ধরে লোকসংস্কৃতি মানব সমাজের রীতি-নীতি আচার-আচরন, ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার, সাহিত্য-শিল্পকলা, খেলা, পার্বন-উৎসব সব কিছুকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এবং সেইসংগে সংগে সাধারন মানুষের কর্মক্লান্ত জীবনে যুগিয়েছে অনাবিল আনন্দ ও প্রেরনা শক্তি। তাই সমাজের খেটে খাওয়া মানুষ বংশপরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরন সযত্নে লালন ও ধারন করে চলেছে। ---------- যুগে যুগে তারা গান, ছড়া, লোককথা, কিম্বদন্তীর নানারকম উপাদানে লোকসংস্কৃতির অংগনকে জীবন্তভাবে সাজিয়ে চলেছেন।

শ্রী পরিতোষ দত্ত লিখেছেন, "সংস্কৃতি আত্মার ন্যায় চলমান, তা মাত্র একটি স্থানকেই আলোকিত করে না, তার রেশ আমরা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত দেখি। সেজন্যই আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, চাল-চলন ইত্যাদির মধ্যে আমরা একে অপরের নিকটে চলে আসি। একে অপরের সাহায্য নিতে বিচলিত হই না।"

এই প্রসংগে শ্রী চারু চন্দ্র সান্যাল মহাশয় বলেছেন,---

‘একম্ সৎ

পণ্ডিতাঃ বহুধা বদন্তি।’

— সব মানুষই এক। বুদ্ধিমানেরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদের ভাগ করে রেখেছে।

টোটোদের মধ্যে মৃত্যুর পর নতুন কাপড় দিয়ে শবদেহ ঢেকে কবর দেবার প্রথা রয়েছে। হিন্দুদের মতো কোনও স্ত্রীলোক মৃতের সংগে কবরখানায় যেতে পারে না। স্বামীর মৃত্যুর পর শোকের চিহ্ন হিসেবে স্ত্রীলোককে বারো মাস একটি লাঠি বহন করতে হয়। তুলনীয় যে, হিন্দু মেয়েরা সাদা থান কাপড় পরে।

বর্তমানে টোটো স্ত্রীলোকরা শোকের চিহ্ন হিসেবে বারোদিন একটি লাঠি বহন করে।

মৃতদেহ কবর দেবার পর মৃতের নামে ‘কুইসাংপাওয়া’ নামে পারলৌকিক কাজ করতে হয়। এই অনুষ্ঠানের দিন মৃতের নামে পান, সুপারী, ‘ইউ’ মৃতের কবরের উপর উৎসর্গ করা হয়। এসময় পুরোহিত এই ভাবে মন্ত্র পড়ে, ------

"ইয়ুত্রি চাপু তি অংপু, ইউ অেপু ।
আম্মা চাপু ইমিস্তা যাইতু ।
ইযান উতা, তাংকোলা যাইতু,
নাকো নিমত্, শা-এত্
নপে সিপিবুতেছে,
কিহিমুপা আয়ুউ''।"

ভাবানুবাদঃ-

ভাত দিলাম, জল দিলাম,
ইউ দিলাম ।
এবার তুমি বিলীন হও ।
মাটিতে প্রবেশ করো
বা উত্তরে যাও ।
তোমার তৃষ্ণা মিটিয়েছি
তুমি চলে যাও ।
যেখান থেকে তোমার জন্ম,
যাও, সেখানে ফিরে যাও ।

(ভাবানুবাদ-- ক্ষমা বসু)

টোটোদের মধ্যে পরকাল সম্পর্কে বিশেষ কোনও ধারনা নেই। প্রধান পুরোহিতের ধারনা এবং বক্তব্য এই যে, মানুষের মৃত্যু এবং জন্ম সূর্যের সংগে সম্পর্কিত। সূর্য যেখান থেকে উদয় হয়, মানুষের জন্মও সেখান থেকেই। বৈজ্ঞানিক কোনও ধারনা না থাকবার ফলে, সূর্য যেখানে অস্ত যায়, মৃত্যুর পর মানুষের 'টুং সিটুং নাথি' অর্থাৎ আত্মাও সেখানেই বিলীন হয়ে যায়।

আবার টোটোদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে, উত্তর দিকের 'বাদু পাহাড়'-ই সব জন্ম-মৃত্যুর উৎস। দেবতারাও উত্তর দিকের ঐ 'বাদু পাহাড়'-য়েই অবস্থান করেন।

পুরোহিতদের মধ্যে যারা সমাজে প্রতিপত্তি অর্জন করতে পারেন, তারা স্ব-জাতির সরল মানসিকতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আধিদৈবিক ক্ষমতার প্রচার করেন। অন্যান্য জাতি উপজাতিদের মতো টোটোরাও বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পরেও একটা আত্মিক অস্তিত্ব থেকে যায়। তাই পুরোহিতের দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী 'কুইসাংপাওয়া' নামের অনুষ্ঠানটি করে। কারন টোটোদের ধারনা এই ধর্মীয় পারলৌকিক অনুষ্ঠানটি করলে মৃত আত্মারা তাদের জন্য নির্দেশিত বাসভূমিতে যেতে পারবে।

গৃহদেবতা 'জি-রি'-র পূজা করবার বিধান আছে টোটোদের মধ্যে। এই দেবতার পূজা করলে গৃহের সকলেরই ভালো করবেন তিনি, এটাই তাদের বিশ্বাস। সুখার্ত দেবতা যাতে পরিবারের কারও কোনও ক্ষতি না করেন সেই প্রার্থনা থাকে এই পূজায় এবং ওই দেবতার পিপাসা মেটাবার জন্যই হয়তো 'ইউ' এবং পশুবলি দেবার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে।

আদি কাল থেকেই টোটোদের মধ্যে সামাজিক আচার বিচার বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে এসেছে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসন একদল মানুষ যেমন মানব সভ্যতার অগ্রগতির জন্য সচেষ্ট, অন্য আর এক দল আবার সেই অগ্রগতির পথের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। নিজ স্বার্থ ও ক্ষমতার মোহে তারা মানুষের অসহায়তা, নিরক্ষরতা, অবৈজ্ঞানিক মানসিকতার সুযোগ নিয়ে অনৈক্যের আতাবরণ সৃষ্টি করে অন্ধকারের দিকে মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে। পদ্ধতি ও কৌশলগত সহায়তায় এরা ধ্বংসের ভূমিকা পালন করে। টোটোরাও সামাজিক হিসেবে ধর্মীয় ও সামাজিক আচরন ও অনুশাসন মেনে চলে তাদের মানসিক গঠন ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে। সময় ও পরিস্থিতির অনেক বদল হলেও তাদের আচারবিচার বর্তমান অবস্থার সংগে খাপ না খেলেও অন্ধবিশ্বাসের কারনে কুসংস্কারগুলি রূপান্তরিত হয়ে রয়ে গেছে ধর্মীয় অনুশাসনের বিধিবদ্ধ বিধানে। টোটোরা আজও তাই ধর্মীয় সংস্কারের

বেড়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে জীবন কাটাচ্ছে ।

ড: বরুন কুমার চক্রবর্তী তাঁর 'লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার' বইটিতে লিখেছেন, "সংস্কার উদ্ভবের মূলে ধর্মীয় নির্দেশ বা আচার কম গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা গ্রহন করেনি, বস্তুতপক্ষে ধর্মীয় নির্দেশ এবং আচার আচরন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংস্কার সৃষ্টির উৎস । পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ হল বেদ, আবার বেদের প্রাচীনতম অংশ হল 'ঋকবেদ' । কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত ঋকবেদে আমরা কিছু সংখ্যক সংস্কার অথবা সংস্কারের মূলের সন্ধান পাই । আজও আমাদের সংহত সমাজে এইসব সংস্কারের এবং বিশ্বাসের অনেকগুলিই বেশ বহাল তবিয়তেই বিরাজমান, অথচ এগুলির উৎসের কথা আমাদের অনেকেরই অজানা ।

পেঁচার ডাককে অমংগলসূচক বলে গন্য করা হয়ে থাকে । বেদে এহেন পেঁচকের ডাকজনিত অমংগল নাশের জন্য মন্ত্রও রয়েছে,----

— "যদুলূকো বদতি মোঘমেতদ্ যৎ কপোতঃ পদমগ্নৌকৃনোতি ।
যস্য দূতঃ প্রহিত এষ এতৎ তস্মৈ যমায় নমো অস্ত মৃত্যবে ।"

--- ঋকবেদসংহিতা ১০ম মন্ডল ।

-১৬৫ সুক্ত ।

পশুবলিদানের সময় বলিদানের জন্য নির্দিষ্ট পশুটির গায়ের রঙও বিবেচনা করা হয়ে থাকে । বেদে বলা হয়েছে সাদা পশু বলি দিলে সে ক্ষিপ্র স্বর্গ থেকে ফল নিয়ে আসে, কারন সাদা পশু বায়ু দেবতার অত্যন্ত প্রিয় । ----

-কৃষ্ণ যজুঃ ২য় খন্ড, ১ম প্রপাঠক,

১ম মন্ত্র ।

ডঃ বরুন কুমার চক্রবর্তী আরও লিখেছেন, "এইভাবে আমাদের দেশের বহু সংস্কার এবং বিশ্বাস ধর্মীয় নির্দেশ অথবা আচার থেকে উদ্ভুত হয়েছে । কেবল আমাদের দেশে অথবা সমাজে নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশের সংস্কার সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেই সেই দেশের আচরনীয় ধর্মের এক গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রয়েছে স্বীকার করতে হয় ।'

সভ্যতার বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে এলেও প্রকৃতির বিভিন্ন ধরনের রোগ, ব্যাধি, মহামারী ইত্যাদি অসহায়তাকে ভিত্তি করেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান ও বিশ্বাস, পরমশক্তিতে বিশ্বাস, অশরীরি ও দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করেই মানুষ তাতে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছিল। আর এ থেকেই জন্ম নিয়েছিলো মানুষের ধর্ম, বিশ্বাস এবং নানাধরনের আচার-অনুষ্ঠান। ধর্ম, বিশ্বাস মানুষের জীবনকে যুগ যুগ ধরে প্রভাবিত করে এসেছে। এই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়েই কিছু মানুষ সম্পদ ও ক্ষমতার লোভে নানা মতবাদের বেড়াজালে সাধারন মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। টোটোরাও এই ধর্মীয় বিভ্রান্তির হাত থেকে নিস্কৃতি পায়নি। শ্রীঅমল কুমার দাস মহাশয় লিখেছেন, আদিবাসী সমাজ প্রকৃতি নির্ভরশীল। অর্থাৎ প্রকৃতি অবলম্বন করেই আদিবাসী সমাজের অর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা এবং মানসিকতা গড়ে উঠেছে। --- আদিবাসী সমাজ| সংস্কৃতি--লোক সমাজ |সংস্কৃতি, লোক সংস্কৃতি-- উপনগর ও নগর সমাজ একটি ধারার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত।

সাঁওতাল, মুন্ডা, ভূমিজ, কোড়া, মাহালী প্রমুখ আদিবাসীরা প্রাক্‌দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাভাষী হিসেবে চিহ্নিত। ওঁরাও, মাথ, পাহাড়িয়া জনজাতিদের মধ্যে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ও রয়েছে। উত্তরবংগের ভুটিয়া, লেপচা, গারো, রাভা, মেচ টোটো জনজাতি মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষাভাষী হিসেবে চিহ্নিত। উল্লিখিত

প্রত্যেক জনজাতির ভাষা, সামাজিক আচার-আচরন বিভিন্ন ধরনের হলেও তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মে অদ্ভুত এক সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়।

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য, চতুর্থ খণ্ড, বাধা-তে লিখেছেন, বাংলা অক্ষরে নিখুঁত প্রাদেশিক উচ্চারন অনুযায়ী কথ্যভাষা প্রকাশ করা যায় না, শুধু বাংলা কথ্য ভাষা কেন, কোন ভাষার অক্ষর দ্বারাই কোন কথ্য ভাষাই নিখুঁতভাবে প্রকাশ করা যায় না। সেইজন্য এই উদ্দেশ্য ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গন এক 'ইন্‌টারন্যাশনাল ফোনেটিক ট্রান্সক্রিপশন' ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে রোমান অক্ষরের মধ্যেই ভাষাতত্ত্বের আন্তর্জাতিক পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক স্বীকৃত নানা চিহ্নের ব্যবহার করিয়া প্রাদেশিক শব্দগুলিকে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা কেবলমাত্র ভাষাতত্ত্ববিদেরই বোধগম্য হইতে পারে।

টোটোদের নিজস্ব কোনও বর্ণ বা লিপি নেই। তাদের গল্প, ধর্মকথা, আচার-আচরন, পূজার মন্ত্র সবকিছুই মুখে মুখে রচিত। যুগপরিবর্তনের ফলে সবকিছুই আস্তে আস্তে বদলেছে। টোটোদেরও অলিখিত মৌখিক কথা, কাহিনী, বিষয়েরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।